মৃত্যুর এক বছর পরে শম্ভু মিত্রের নব জন্মদিনে শাঁওলী মিত্রের কিছু চিন্তা

দেশ

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ পনেরো টাকা

বিশ-ত্রিশ দশকের সাতটি নক্ষত্র,
প্রত্যেকেই ছিলেন বিশ্বের মাপে তৈরি

বাঙালির দর্শনচিন্তার যখন ছিল মধ্যগগন

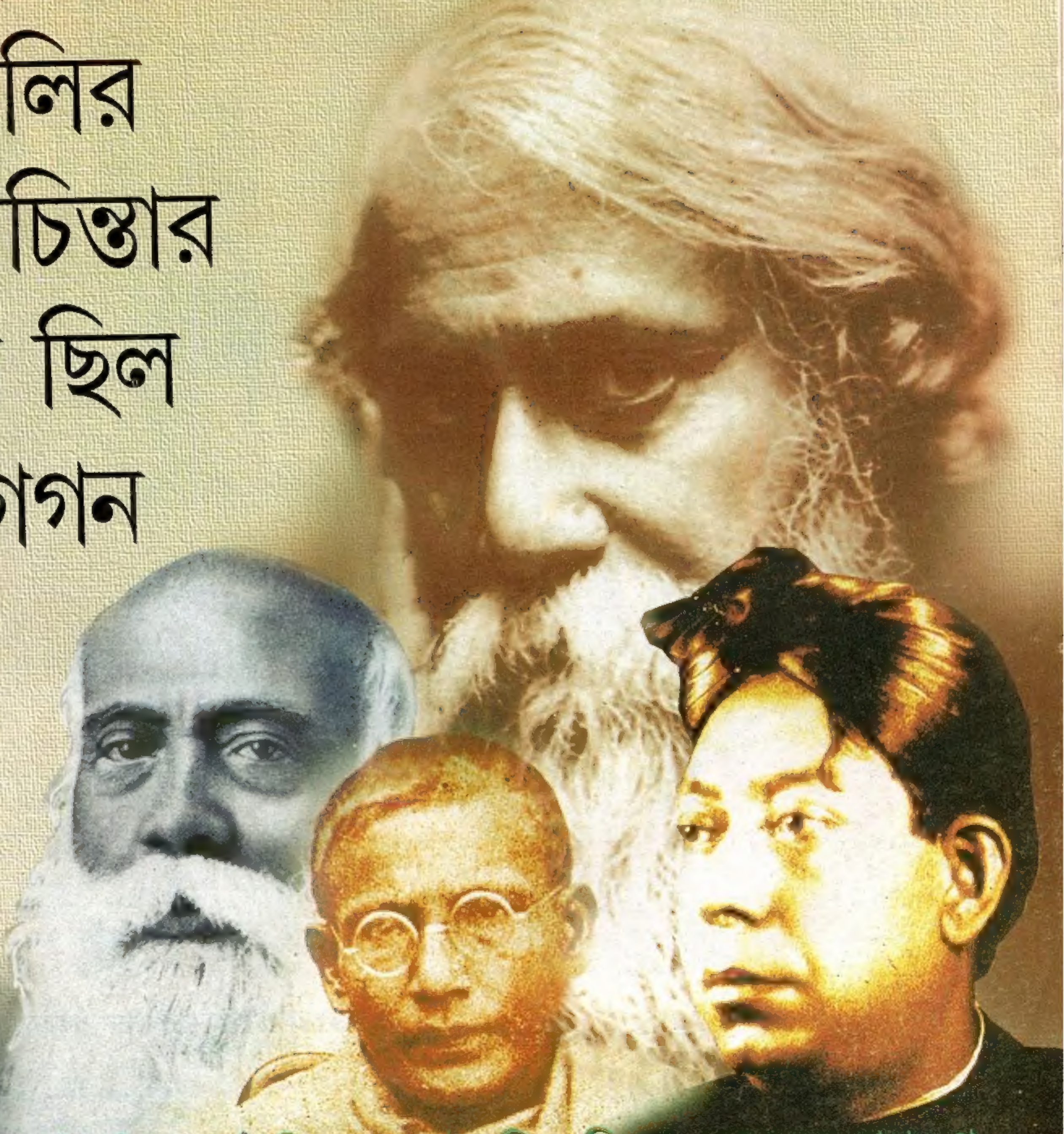

যুদ্ধবিরোধী বিবৃতির শ্রেষ্ঠ চিত্রকর অটো ডিক্স বিষয়ে শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেশ
১৯ ভাদ্র ১৪০৫ • ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ • ৬৫ বর্ষ ২৩ সংখ্যা

প্র চ্ছ দ নি ব ন্ধ

দর্শনচিন্তার মধ্যগগন

নক্ষত্র বিস্ফোরণ — মধ্যাহ্ন সূর্য যখন আমাদের মননাকাশকে দীপ্ত করে রেখেছে — সেটা বিশ-ত্রিশ দশকের কথা — সাতজন পথিকৃৎ তখন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে নূতন সংজ্ঞা ও নূতন জিজ্ঞাসা যুক্ত করছেন। এঁরা প্রত্যেকেই নক্ষত্র। অধিকাংশই ঊনবিংশ-বিংশ শতকের পাশ্চাত্যের মনীষার মাপেও প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। তখন পশ্চিমের হেগেল-কান্ট তত্ত্বস্রোতের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ঐশ্বর্যময় সূত্রগুলিকে মিলিয়ে নবায়িত-নব্যন্যায় পরিশীলিত হচ্ছে একদিকে। অন্যদিকে পুরাতনের মধ্যে বৃহত্তম যে-স্রোতটি ছিল অধ্যাত্মবাদের, সেটিও নূতন ব্যাখ্যা, সন্ধান এবং চেতনার সম্মুখীন হচ্ছে। বাঙালির মনন-দিগন্তে এ এক অসাধারণ বিস্ফোরণের যুগ। 'দেশ' পত্রিকার পাঠকদের কাছে ওই যুগ ওই ভাবনার মানুষগুলিকে ফিরিয়ে এনেছেন ড. *তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*। ❑ ২৭

প্র ব ন্ধ

হিতবুদ্ধি হন্তারক এই কাল

তিমিরবিলাসী নন, তিনি ছিলেন তিমিরবিনাশী। কত ক্ষুদ্রতা, আমাদের কত সীমাবদ্ধতা শম্ভু মিত্র শনাক্ত করেছেন, চিকিৎসকের যত্ন ও নিষ্ঠায়। মৃত্যুর পর নাট্যাচার্যের দ্বিতীয় জন্মদিন সমাগত। কন্যা *শাঁওলী মিত্র* আমাদের শিল্প ও নৈতিক ঐতিহ্যের পাতা উল্টে দিনটিকে স্মরণ করতে চান। • ২৩

শি ল্প সং স্কৃ তি

যুদ্ধবিরোধী অঙ্গীকার

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ— হাতিয়ার শিল্পী-মন। কোথায় রং? ক্যানভাস? অন্যান্য উপকরণ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে অটো ডিক্স এঁকেছিলেন বীভৎস কিছু ছবি, অসামান্য সুন্দর কিছু ছবি। যুদ্ধ নাকচ করতে দৃশ্যগুলি ভয়াবহ। আর অন্তর্লীন মানবতার স্পর্শে তারা সুন্দর। আলোচক *শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত*। • ৬৭

সম্পাদকীয় ❑ ৫
চিঠিপত্র ❑ ৭
প্রবন্ধ ❑ রামধনু সংস্কৃতিকে যে রক্ষা করে তারই নাম গণতন্ত্র • হোসেনুর রহমান ❑ ৪৪
কবিতা ❑ পবিত্র মুখোপাধ্যায় • মিঠু সেন • সুতপা সেনগুপ্ত • উমা বন্দ্যোপাধ্যায় • বিজয় সিংহ • অঞ্জনা চক্রবর্তী • বিকাশ গায়েন • সার্থক রায়চৌধুরী • অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় • যশোধরা রায়চৌধুরী • চিত্রা লাহিড়ী • মন্দার মুখোপাধ্যায় ❑ ৭৬
গল্প ❑ পেশাদারের ভূমিকায় • শ্যামল মজুমদার ❑ ৪৪
কালাধারে অবিনাশ • সৈকত রুদ্র ❑ ৫০
ধারাবাহিক উপন্যাস ❑ অগ্নিরথ • সমরেশ মজুমদার ❑ ৫৬
অষ্টম গর্ভ • বাণী বসু ❑ ৬১
শিল্পসংস্কৃতি ❑ ৬৫
গ্রন্থলোক ❑ ৮৩
কখন কোথায় ❑ ৯৩
শেষের পাতা ❑ ৯৪

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

03 MAY 2023
CALCUTTA
BENGAL
INDIAN SUBCONTINENT
₹ 30

সাম্মানিক সম্পাদক সাগরময় ঘোষ • সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী

এবিপি লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ২০ পয়সা। উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

Desh (USPS 007-887) is published fortnightly for an annual subscription of $54.00 by ABP LTD., 6 PRAFULLA SARKAR STREET, CALCUTTA-700 001, INDIA. Our distributor in USA is House of Ananda Inc. 113, Lexington Ave, Rear, New York 10016. Periodicals class postage paid at NY-10199. Post Master Please send address change to House of Ananda Inc. P.O. BOX 1833, NY-10010

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দর্শনের ভাষায় বাঙালির স্বকীয় বিবৃতি শুরু করেন সাতজন পথিকৃৎ তন্মধ্যে উজ্জ্বলতম – ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

দর্শনতত্ত্বের দীপান্বিতায় অগ্নিময় মন

তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অঙ্কন : সুব্রত চৌধুরী

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগে কেবল স্বরাজ-স্বাধীনতার স্বপ্নেই বাঙালি বিভোর থাকেনি, এক স্বকীয় দর্শনশাস্ত্রও গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেছে। অবশ্য যাকে 'নিখাদ দর্শন' ('মেটাফিজিকস') বলা হয়, বাঙালির দর্শনশাস্ত্র চর্চায় তা কতটা পথ অতিক্রম করেছিল সে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইতিহাসচর্চা যেভাবে বাঙালি সাহিত্যমানসকে প্রভাবিত করেছে, দর্শন ততটা করেনি। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ—মৌলিক দার্শনিকতার প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা বাঙালি মননে গড়ে ওঠার ট্রাডিশনও আমরা দেখতে পাই।

আরও একটা ট্রাডিশন তৈরি হতে থাকে বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে। এই ধারার ভগীরথ নিঃসংশয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

বাঙালির দর্শন-চিন্তা এঁদের বাদ দিয়ে হতে পারে না। অবশ্য এই দার্শনিক-ত্রয়ী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এঁদের দর্শন-চিন্তার যোগসূত্র ছিল প্রাচ্যমুখিনতা।

এ বিষয়ে আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করে হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' শীর্ষক গ্রন্থটি। ১৯৪৫ সালে প্রথম প্রকাশিত এই বইটির (চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোম্পানি /কলেজ স্ট্রিট) আর কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বাঙালির তত্ত্বচর্চার ইতিহাস হিসেবে বইটিকে একটি আকরগ্রন্থ বলা যেতে পারে। ওই বইটিতে বিনয়বাবুর মন্তব্য মারফত আমরা বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের কিছু বিখ্যাত বাঙালি দার্শনিকের লেখালেখি ও কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই। সমকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে, এই প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি অবশ্য বিনয়বাবু। তবে বাঙলায় দর্শনচর্চার স্বর্ণযুগ, দর্শন-মনীষায় উজ্জ্বল অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতীদের নাম উল্লেখ করেছেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্পর্কে বিনয়বাবুর মন্তব্য: "ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে আমরা ছোটবেলা থেকে দার্শনিক বলে জানতাম.... সুরেন দাশগুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের চৌহদ্দিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন নানা দিকে,... সুরেন দাশগুপ্তের বইয়ের ইজ্জত বিংশ শতাব্দীর অনেকদিন পর্যন্ত গুলজার থাকবে।"

এই সময়টাকে 'স্বর্ণযুগ' ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। অল্প কয়েকজন সাহেবসুবোর শিক্ষানুরাগ এবং সফল সংস্কৃতচর্চার বাতাবরণে গড়ে উঠেছিল এই দার্শনিকতা। আর এতে যুক্ত হয়েছিল কিছু ঐতিহ্যসচেতন, প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন-ব্রতী বাঙালির প্রেরণা। যে দেশাত্মবোধ স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়েছিল, সেই দেশাত্মবোধই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকেও বিশ্বের দরবারে সসম্মানে উপস্থিত করতে চেয়েছিল।

পশ্চিমি দর্শনে তখন একটা পালাবদলের হাওয়া। এক দিকে ইংরেজদের বাস্তবদর্শনের রমরমা, জর্মন ফেনোমেনোলজির (phenomenology) নবযুগ আর অন্য দিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। ভারতীয় এবং বাঙালি দার্শনিকরা এতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বটে কিন্তু গভীরভাবে প্রভাবিত হননি। তবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দার্শনিক ভাবধারার একটা আদান-প্রদান তখন চালু হয়ে গিয়েছিল, যার সূত্রপাত উনিশ শতকের গোড়া থেকেই। জার্মানির লাইপজিগ, হাইডেলবার্গ ও ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে সংস্কৃত চর্চার 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন দর্শনচর্চার প্রেক্ষাপটটি গড়ে উঠেছে।

এ কথা ঠিকই যে পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকতা বাঙালি দার্শনিকদের কখনওই পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এমনকী নিকুঞ্জবিহারী ব্যানার্জির মতো বাঙালি দার্শনিকরা পাশ্চাত্য দর্শনের লজিক ও অন্যান্য প্রযত্নলালিত বিষয়সমূহকে তাঁদের মস্তিষ্ককর্ষণের কাজে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। যে বাঙালির তত্ত্বচারিতা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রঘুনাথ চিন্তামণির নব্যন্যায়ে মজেছিল তাতে নতুন করে স্রোতসঞ্চার হয় এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। আর, এই নতুন যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। প্রথম যৌবনে ব্রজেন্দ্রনাথ বহরমপুর কলেজে দর্শনের ক্লাস নিতেন হামেশাই ভুলে যেতেন ঘণ্টা বা ঘড়ির

"হোস্টেলে থাকার দিনগুলোতে অনেক কিছুই শিখেছি। জেনেছি সবার সাথে ভাগ করে নেবার আনন্দ, শিখেছি স্বাবলম্বী হতে - আর জেনেছি পুদীনহরার গুণ।"

রিদীপ দাস, লেকচারার। পুদীনহরা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা রোজই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারছি।

যেখানে সেখানে খাওয়া আর বাইরে খাওয়া তো বেড়ে ওঠারই অঙ্গ। বাড়ী থেকে দূরে হোস্টেলে থাকতে রিদীপকেও তাই করতে হতো। পরে কর্মব্যস্ত জীবনে এখনও তা লেগেই আছে। ফল - প্রায়ই পেটের গোলমাল। তবে সমাধান আছে - পুদীনহরা।

পুদীনহরা ঃ প্রকৃতির চিরসবুজ বরদান।

পুদীনহরাতে আছে মিণ্ট (পুদীনা) তেলের সংমিশ্রণ যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত এবং অত্যন্ত কার্যকর। এটি পাচনতন্ত্রে স্থানীয়ভাবে কাজ করে ও ব্যথা কমিয়ে আরাম দেয়। তাছাড়া পুদীনহরায় আছে চমৎকার *এ্যান্টিস্প্যাসমোডিক (যন্ত্রণা উপশমকারী), কারমিনেটিভ (গ্যাস নিবারণকারী) এবং হজমশক্তির গুণ।*

পুদীনহরা ঃ কার্যকরী অথচ কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

সারা বিশ্বে এখন রাসায়নিক পদার্থের সাইড এফেক্ট নিয়ে গভীর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধ সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুদীনহরা হ'ল এমন এক প্রাকৃতিক উপচার যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

একবার পুদীনহরা ব্যবহার করুন। আপনি সর্বদা এতেই ভরসা করবেন।

যেমন করেছেন রিদীপ দাস এবং আরও লক্ষ লক্ষ পুদীনহরা ব্যবহারকারীগণ।

Pudin® Hara লিক্যুইড এবং পার্লস্

সঠিক এফেক্ট. নেই সাইড এফেক্ট.

Dabur

For more information on Pudin Hara, write in with your name, sex, date of birth, education, profession, address and phone no. to: Dabur Pudin Hara (DSH), P.O. Box 7326, New Delhi-110 065.

HTA.5721.98.BEN

কাঁটা'। এতে ক্লাসের ছাত্রদের মনের অবস্থা হত কী কে জানে, তিনি কিন্তু তাঁর উদ্যমে মাতোয়ারা।

স্বদেশী যুগে ও তার পরবর্তী তিন-চার দশকে বাঙালির দর্শনচিন্তার মধ্যে একটা স্বকীয়তা দেখা দিতে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের দার্শনিকদের সঙ্গে বাঙালির এইখানেই বিভেদ দেখা দেয়। বাঙালির দার্শনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা মূলত বেদান্তের পথ ধরে তখন হাঁটছিল। বেদান্তকে তাঁরা পাশ্চাত্য দর্শনের উপরে প্রয়োগ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি জার্মান দার্শনিক কান্টের নৈয়ায়িক পদ্ধতি বৈদান্তিক উপকরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছিলেন। অপরপক্ষে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তিনি জৈন সূত্র ও পাশ্চাত্য আপেক্ষিক চিন্তার সারাৎসার অবলম্বনে এক ধরনের সন্দিগ্ধশীল ও বিশ্লেষণাত্মক দর্শনতত্ত্ব নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ করাটা একান্ত জরুরি যে, বাঙালির দর্শনচিন্তার যে বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তববাদিতা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল, তাতে ব্রিটিশ শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। যে বাস্তববাদী চিন্তাধারা তখনকার দিনের শিক্ষাদানের মজলিশি বিতর্কের আবহাওয়া তৈরি করেছিল তার পুরোধা ছিলেন কয়েকজন অধ্যাপক-দার্শনিক। স্কটিশ চার্চ কলেজের (তখন যার নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশন) অধ্যাপক হেনরি স্টিভেন বা তার অধ্যক্ষ ডক্টর উইলিয়াম হেস্টির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিলেতে যে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বাঙালি ছাত্ররা দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবার আগে আসে অধ্যাপক ডক্টর ম্যাকটাগার্টের নাম। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁরই তত্ত্বাবধানে কেমব্রিজে পি এইচ ডি করেন।

বাঙালির দর্শনচর্চা কেবলমাত্র অধ্যাত্মচিন্তার ঘেরাটোপে আটকে থাকেনি। অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ—এ দুটি দিকই আবিষ্কার করা যায় বাঙালির নব্য দর্শনচর্চায়। এক দিকে যেমন সেখানে রয়েছে গোড়া আধ্যাত্মিক চেতনা অন্য দিকে সেখানে তেমন যুক্তিকামী ও বস্তুনিষ্ঠ মৌলিক প্রশ্নের দর্শনও দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত স্বদেশীযুগের দর্শনচর্চাকে লক্ষণ অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক ও মৌলিক—এভাবে ভাগ করতেও দেখা গিয়েছে। বিনয়কুমার সরকার, কালিদাস ভট্টাচার্যের মতো পণ্ডিতেরা মনে করতেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'প্রত্নতাত্ত্বিক' ঘরানার দার্শনিক। যেহেতু তিনি প্রাচীন

সমকালের সঙ্গে মহাপ্রাচীন দর্শনচিন্তার এক শাশ্বত যোগসূত্রের সন্ধান করে গেছেন সুরেন্দ্রনাথ আজীবন

সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত পাঠ্যের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং এই শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রাক-বৌদ্ধ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লেখক বেণীমাধব বড়ুয়াকে। অপর পক্ষে মৌলিক দার্শনিক হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যকে।

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন এক চিন্তার কারিগর, নব্যবেদান্তের প্রথম ব্যাখ্যাকার। অবশ্য তাঁর বর্ণিত নব্যবেদান্ত বাঙালির দর্শন-চিন্তার স্থায়ী কোনও প্রভাব ফেলেছিল এমন বলা যায় না। তবে নববৈদান্তিক হিসাবে তিনি সমকালীন দর্শনের পাঠ্যক্ষেত্রে কিছু মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সূত্রকার—এক নবনৈয়ায়িক। তার পাণ্ডিত্য ছিল প্রশ্নপ্রক্রিয়া উৎপন্ন। কেবলমাত্র জার্মান কান্টীয় বা প্রজ্ঞাসংক্রান্ত লজিক নয়, কৃষ্ণচন্দ্র বেদান্তের তাত্ত্বিক প্রশ্নসমূহকে পাশ্চাত্য লজিকের সমকক্ষ করে তুলেছিলেন।

উল্লেখ্য, বেদান্ততত্ত্বকে সর্বপ্রথম প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক চিন্তার গোত্রভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মার্কিন শ্রোতারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন "সমাধি কি বিষয়ীকে (subject) বিষয়ে (object) নিমজ্জিত করার অবস্থা?" উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "বিষয়ীকে বিষয়ে নয়, বিষয়কে বিষয়ীতে লীন করা। বাস্তবিক এই জগৎ লোপ পায়, কেবল 'আমি' থাকি—একমাত্র 'আমি'ই বর্তমান।" বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এখানে শেলিং অথবা হেগেলের পথপরিক্রমা করছেন। এটা বেদান্ত দর্শনের পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকতার সামান্যতা অর্পণ করার

সুরমা দাশগুপ্ত

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মেধা তাঁকে বিখ্যাত হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। সমাজ তাঁকে যত দূর সম্ভব বেইজ্জত বেআব্রু করার চেষ্টা করেছে। অবশেষে গত ১২ জুন সুরমা দাশগুপ্তের মৃত্যু হল মধুপুর কপিল মঠের ভক্ত নিবাসে। বয়েস হয়েছিল নব্বই। নিছক সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবেই তাঁর পরিচয় নয়। মেধা ও স্বভাবস্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। তাঁর গোটা ছাত্রজীবনটি পদক, পুরস্কার আর মেধা-বৃত্তিতে মোড়া। কলকাতা ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে পি এইচ ডি সুরমা দাশগুপ্ত তাঁর স্বামীর লেখা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'এ হিস্টরি অব ইন্ডিয়ান ফিলজফি'র শেষ তিন খণ্ড সম্পাদনায় সাহায্য করেছিলেন। শেষ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সময়ে (১৯৫১) সুরেন্দ্রনাথ মুমূর্ষু, রোগশয্যায় শায়িত, জীবনের শেষপ্রহরে। প্রিয় শিষ্যা, যোগ্য সহধর্মিণী স্বামীর জ্ঞান ও প্রাণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিজের লেখালেখি, নিজস্ব দর্শন-চিন্তার ফুরসৎ পাননি। নিজের বলতে তাঁর মাত্র দুখানি বই—'ডেভেলপমেন্ট অব মরাল ফিলজফি ইন ইন্ডিয়া,' আর, 'অ্যান এক্সপানডিং কোয়েস্ট অব লাইফ অ্যান্ড নলেজ'।

ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কী করে সরিয়ে রেখে পরমারাধ্যের কাছে আত্মনিবেদন করা যায় সুরমা দাশগুপ্ত তাঁর বিরল দৃষ্টান্ত। এক দর্শন-চিন্তা ছাড়া (বেদান্ত ও পাশ্চাত্যদর্শন— দুয়েতে তাঁর দখল ছিল।) আর সব ক্ষেত্রেই তাঁদের দাম্পত্যের ছবিটি বাইরের দুনিয়ার কাছে আপত্তিকর লাগতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বয়েসে সুরমার প্রায় পিতৃসম ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কুদর্শন, বিপুলাকার। সুরমা তন্বী, শ্যামা, কাজলনয়না। যে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ-সুরমার বিবাহ হয় তখন সুরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, রুগ্‌ণ।

তবু কেন এই বিবাহ। ঘনিষ্টলোকেরা বলেন প্রিয় শিক্ষক, গুরুপ্রতিম সুরেন্দ্রনাথকে অপবাদ ও কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতেই সুরমা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পরিবার-পরিজন (মায় পুত্র অবধি) এর জন্য সুরমার সম্পর্কে নানাবিধ কুৎসা রটনা করেছিলেন। অনেকের ধারণা, সুরেন্দ্রনাথ যে ধরনের মানুষ ছিলেন তাতে বিবাহ সম্পর্কে সংশয়, অনাস্থা আসাটা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব ছিল না। সময়টা যদি আজকের মতো হত কেমব্রিজের অধ্যাপকের তা হলে হয়তো সুরমাকে বিবাহকে সামাজিক নিন্দে-মন্দের হাত থেকে বাঁচাতে হত না। ওঁরা বিবাহবন্ধনহীন চিরবন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারতেন।

কর্ম অবসরের পরেও সুরমা দাশগুপ্ত দেশে ফিরে আসতে সাহস পাননি। বলেছেন, অনেক অত্যাচার করেছে ওরা। মারধরও করেছে, দেশে গেলে আবার মারবে। এই ওরা কারা তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদের প্রসঙ্গে তাঁর উইলে সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন তাঁর কোনও সন্তান বা স্ত্রী তাঁর মরদেহের অন্ত্যেষ্টির অধিকারী হবেন না। মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধাদির অধিকার পাবেন না। সে অধিকার থাকবে স্ত্রী (বর্তমান) সুরমা দাশগুপ্তর।

নীলপাড়, সাদা শাড়ি, মেধা-উজ্জ্বল শাণিত দীপ্তিময়ী নিরহঙ্কার, নিরাভরণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমী সুরমা দাশগুপ্তর শেষজীবনটা কাটে মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর মতো। জামশেদপুরের বৃদ্ধাবাস থেকে মধুপুরে এসে সন্ন্যাসী স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্যের দীক্ষিত শিষ্যা হন।

জীবনের শুরু থেকেই তো তিনি এক অর্থে মঠবাসিনী। শেষ তো এরকমই হওয়ার কথা ছিল। এই বেদনাবিধুর জীবনটিও তো আর এক দার্শনিকতা! জীবনানন্দের ভাষায়, "বিপন্ন বিস্ময়!" ঝরে যাওয়ার হেমন্তের ধূসর-সত্যের মতো।

পদক্ষেপ। এই বেদান্তভিত্তিক যুক্তিচর্চাকেই নব্যবেদান্তের উষা বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই নব্যবেদান্তের ঘোষিত অর্থে প্রতিষ্ঠাপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (অবশ্য স্বামী অভেদানন্দ ও হেগেলপন্থী হীরালাল হালদারকে নব্যবেদান্তের প্রথম পথিকদের দলভুক্ত করা হয়)। কৃষ্ণচন্দ্র যে বেদান্ত-দর্শনকে নব্যবেদান্ত মতে পরিবর্ধিত করার সংকল্প করেছিলেন তার গোড়া আছে তাঁর পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষায়। ১৮৭৫ সালে হুগলির শ্রীরামপুরে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ঠাকুর্দা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত উমাকান্ত তর্কালঙ্কার। পিতৃদেব কেদারনাথের প্রভাবে এবং পারিবারিক সংস্কৃতচর্চার ট্র্যাডিশন কৃষ্ণচন্দ্রকে সহজেই প্রাচীন শাস্ত্রবিধি অবলম্বন করে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিল।

ঠাকুর্দা উমাকান্ত সংস্কৃত পণ্ডিত হলেও চিন্তায় কিছুটা উদারপন্থী ছিলেন। তিনি শ্রীরামপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভাষাতাত্ত্বিক জশুয়া মার্শম্যান সাহেবের বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন এবং ভবিষ্যতে শিক্ষকতায় যখন উত্তরোত্তর উন্নতি করেন তখনও তাঁর ধার্মিক মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বড় ছেলে গোপীনাথ ভট্টাচার্য বাবার এই ঐতিহ্যপরায়ণতার কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন ('কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা সঙ্কলন'-এর সম্পাদনায়) যে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশ কৃষ্ণচন্দ্র তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি জাতীয়তাবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনচিন্তায় 'স্বদেশ', 'স্বধর্ম' গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোপীনাথ লিখেছেন, "he was a firm believer in the Hindu code of values and was a bitter opponent of all who maligned it."

কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৯১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর উচ্চশিক্ষার খরচ বহন করেছিলেন কাকা নারায়ণচন্দ্র—সে যুগের এম এ, তাও আবার ইংরিজি সাহিত্যে। তিনি তদানীন্তন বাংলা সরকারের সচিবালয়ে অনুবাদকের কাজ করতেন। তাঁর আর্থিক সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।

এই প্রেসিডেন্সির ক্লাসরুমেই কৃষ্ণচন্দ্রের পশ্চিমি দর্শনশাস্ত্রে হাতেখড়ি। উনিশ শতকের শেষ যুগ তখন। কান্ট ও হেগেলের মতাদর্শে আচ্ছন্ন—ছাত্র বা শিক্ষক—উভয়পক্ষই। 'ব্যক্তি'—যাকে দর্শনে 'আমি' বলা হয় এবং অপরপক্ষে ব্যক্তি ব্যতিরেক যে বিশ্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ 'বস্তু' বা 'বিষয়সমূহ'—এই দুই মেরুধর্মী অস্তিত্বের বাইরের কোনও বিষয়কেই তখন দার্শনিক প্রশ্নের বিবেচ্য বলে মনে করা হত না। বেদান্তের শৃঙ্খল কোনওদিন অস্বীকার না করলেও কৃষ্ণচন্দ্র যে এই পশ্চিমি দর্শনের আবহাওয়ায় বড় হচ্ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লজিক ও বাস্তব জগতের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তাঁকে ভাবাত। আধুনিক দর্শনে 'লজিক' বা 'ডিসকোর্স'—অর্থাৎ বাক্য দ্বারা সত্যনির্ণয়—একটি প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনচর্চায় এই আধুনিক 'বোধ'টি কাজ করেছিল, যে কারণে তাঁকে

নেহাত এক বেদান্তবাগীশ বলা যায় না। বেদান্ত পাঠের জন্য তিনি বৈদান্তিক লজিকের ব্যবহার কায়েম করেন। এটা সহজ কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বেদান্তকে আপাদমস্তক অধ্যয়ন করে একটা পারিভাষিক সমালোচনা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বেদান্তকে দর্শনের স্তরে স্থান করে দেওয়া এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্যকে পশ্চিমি লজিকের স্রোতমুখী করাই ছিল তাঁর সাধনা। কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন। তাই তিনি শাস্ত্রের নির্গলিতার্থ আহরণ করতে সমর্থ ছিলেন। প্রাচ্য বেদান্ত এবং পশ্চিমি লজিকের নিহিত সত্যকে তিনি অনায়াসে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে নিতে পারতেন। বেদান্ত দর্শন পাঠ করে যে চরম সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে পেরেছিলেন, তাকে তিনি **'অলটারনেশন'** নাম দিয়েছিলেন।

বেদান্ত মতে জগৎ মায়া অথচ ব্রাহ্মণই একমাত্র সত্য। জগতের মায়াকে যেমন অস্বীকার না করে মানুষের উপায় নেই, তেমনই তার মায়াবী রূপ না স্বীকার করলেও ভ্রান্তি ঘোচে না। এই মহামায়াকে যেমন স্বীকার করতে হয়, তেমন এর অস্বীকারেই সত্যের উন্মোচন। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কেই কৃষ্ণচন্দ্র **'অলটারনেশন'** বলেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রচনার অন্যতম সঙ্কলক ও ভাষ্যকার জর্জ বসওয়ার্থ বার্চ তাঁর 'সার্চ ফর দি অ্যাবসলিউট ইন নিওবেদান্ত'তে বলেছেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই **'অলটারনেশন'**তত্ত্বটি তর্কশাস্ত্রে তাঁর সর্বোচ্চ মৌলিক অবদান। ১৯২৫ সালে রাধাকৃষ্ণন যে 'ইন্ডিয়ান ফিলজফিকাল কংগ্রেস' শুরু করেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সেই সভায় 'শঙ্করস ডকট্রিন অব মায়া' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শঙ্কর-ভাষ্যের মূলমন্ত্রকে বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে 'স্বয়ংপ্রভ' সত্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জগতের পরম কারণটিকে **'অলটারনেশন'** শব্দ দ্বারা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছিলেন। বসওয়ার্থ লিখেছেন, "To define the absolute was his idea from beginning to end... he defines the absolute... in the third phase as Alternation." এই **'অলটারনেশন'** শব্দটির মহিমা প্রকাশ পায় এক অদ্ভুত মায়াময় চিত্রে। যেখানে চরাচর একত্র উন্মোচনে নিত্য তথা অনিত্য, স্থির তথা চঞ্চল, অস্তিত্বশীল তথা পলাতক।

এই শতাব্দের প্রথম পর্যায়ে যিনি আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের তত্ত্বে দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর নাম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ব্রজেন শীলের ক্ষেত্রেও আমরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। বিনয়বাবু ব্রজেন শীলের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এক ঘনিষ্ঠতার ফলশ্রুতিই তাঁদের একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা এবং পুস্তক প্রকাশের যুগ্ম প্রচেষ্টা। বিনয়বাবু ছিলেন ব্রজেন শীলের অনুগত ভক্তবৃন্দের অন্যতম—তাঁকে 'গুরু' বলে মানতেন। অবশ্য বিনয়বাবু ছিলেন স্পষ্টবাদী। অপরাপর পণ্ডিতদের সম্পর্কে রূঢ় সত্য কথা বলতে তাঁর মুখে আটকাত না। ব্রজেন শীলও বাদ পড়েননি। তাঁর প্রসঙ্গেও বিনয়বাবুর নানা মন্তব্য ('অলস', 'কুদৃষ্টান্ত', 'কীর্তিহীন') আছে। তবে বিনয়বাবু তাঁর 'বৈঠকে' ব্রজেন শীল সম্পর্কে দু-চারটি যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তার একটি এখানে উল্লেখ করছি। বিনয়বাবু লিখছেন : "ব্রজেন শীলকে আমরা দার্শনিক বলতাম না—বলতাম লোকটা বিদ্যার জাহাজ ; প্রকাণ্ড বিদ্যাদিগগজ, সর্ব বিশারদ পণ্ডিত—জ্যান্ত বিশ্বকোষ। ...তিনি একালের বহুত্বনিষ্ঠা (প্লুরালিজম) প্রচার করেছেন। এ বিষয় তাঁকে জার্মান গিয়ের্কে, ফরাসি দুর্খেই এবং ইংরেজ ফিগিস ইত্যাদি আইন পণ্ডিতদের 'এক গেলাসের ইয়ার' বলতে পারি।"

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানে সাধারণত প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে অন্বেষণের কাজে বরণ করা হয়। পশ্চিমি বিজ্ঞান বাস্তব জগৎকে সত্য বলে মানে। ব্রজেন শীল বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন বটে তবুও তাঁর বিজ্ঞান-চেতনাকে পশ্চিমি ধাঁচের বলে মনে করা যায় না। তাতে আমরা প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় রহস্যভেদ করতে পারি। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'পজিটিভ সায়েন্সেস অফ 'এনশিয়েন্ট হিন্দুজ'-এ ব্রজেন শীলের প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির প্রমাণ মেলে। বইটির শিরোনামে 'পজিটিভ' শব্দটি নিতান্তই উনিশ শতকী 'কঁতীয়' অর্থে ব্যবহৃত 'পজিটিভ' অর্থাৎ 'বস্তুনিষ্ঠ' এই হিসাবে। কিন্তু আচার্য শীল তাঁর গ্রন্থে আমাদের দেখিয়েছেন 'কঁতীয়' বা 'স্পেনসরীয়' 'পজিটিভ' দর্শনে যে 'প্রখর বাস্তবতা'র আধিক্য ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানে তার হদিশ মেলে না। প্রাচ্য বিজ্ঞানে পজিটিভ শব্দটি যে পরাবাস্তবিক তাৎপর্য পায়, সৃষ্টির রহস্যের যে

পাশ্চাত্য দর্শনের উপর বেদান্তের প্রয়োগ যে সম্ভব, তা প্রমাণ করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

নব্যবেদান্তের প্রতিষ্ঠাপুরুষদের মধ্যে অন্যতম স্বামী অভেদানন্দ

গভীরতর ব্যাখ্যা মেলে সেখানে—আচার্য শীল সে কথাই জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর বিজ্ঞানে তিনি শুরুতে সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের 'প্রকৃতি'—অর্থাৎ জাগতিক প্রথম কারণের সংজ্ঞা নিরূপিত করেছেন। এই সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের ভিত্তি থেকেই গোটা 'পজিটিভ সায়েন্সেস' গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। যে বিষয়গুলিকে আচার্য শীল প্রাধান্য দিয়েছিলেন তার মধ্যে আছে রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রজননবিদ্যা, স্থান-কাল বিষয়ক জ্ঞান, গণিত এবং এমপিরিকাল অর্থাৎ পরীক্ষামূলক জ্ঞানান্বেষণ।

এই 'পজিটিভ সায়েন্সেস'-এর অপরিসীম মূল্য লেখকের 'প্রক্রিয়াইঙ্গিতে'— দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় মেথডলজি—তার ব্যাখ্যায়। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই এর বৈশিষ্ট্য, উপকরণ নয়। আচার্য শীল নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন কোনও তত্ত্বকে তার বইতে স্থান দেননি প্রাচীন কোনও টীকাভাষ্য বা সূত্রগ্রন্থে যার উল্লেখ নেই। এমনকী ব্যক্তিগত মতামতকেও বর্জন করেছেন। বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ভাষার প্রসাদগুণে বইটি চূড়ান্ত সফল। প্রাচীন আভিধানিক শব্দকে সমসাময়িক ইংরিজি বা বাংলা পরিভাষায় বদলে নেওয়ার কাজটিও সহজ নয়। কিন্তু কোথাও ভাষা দুর্বোধ্য ঠেকে না।

ইংরিজি গদ্যে ব্রজেন শীলের চমৎকার দখল ছিল। তাঁর স্টাইলের দৃষ্টান্ত তাঁর চিঠি অথবা বৈঠকি আড্ডায় বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন নিজেও রবীন্দ্রনাথকে ঋষিতুল্য ভাবতেন। বিশ্বভারতীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আচার্য শীল বলেছিলেন, "পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা সাধন হয়েছিল, তাদেরই যুগের উপযোগী করে সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।" ভারতীয় দর্শনে আচার্য শীলের অবদান এই বৃহৎ চিন্তার প্রেক্ষিতকে উন্মোচিত করা। সাংখ্য-পাতঞ্জল, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, চরকশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সঞ্চিত ছিল সেই সম্যক বিদ্যাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

আজকের ভাষায় যাকে তুলনামূলক দর্শন বলা হয় তারও প্রথম পথিক সম্ভবত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ১৯১১ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে এক সেমিনারে (একে 'প্রথম বিশ্ব জাতি কংগ্রেস' বলা হয়েছিল) আচার্য শীল 'রেস অরিজিনস' নামে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। সেখানে মানববিজ্ঞান বা অ্যানথ্রপলজি বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার তুলনামূলক পদ্ধতি মাফিক 'পজিটিভ সায়েন্সেস'-এ তিনি নিউটন, স্পেনসার, ডারউইন, লাপ্লাস, জন স্টুয়ার্ট মিলের হরেক সিদ্ধান্তকে প্রাচ্য বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ব্রজেন শীল ভাস্করাচার্যের গাণিতিক তত্ত্বকে নিউটনের সমকক্ষ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রাচ্যবিজ্ঞান প্রেমের পিছনে সূক্ষ্মভাবে তাঁর স্বদেশপ্রেমও কাজ করত না? আচার্য শীল বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য ও বিভেদ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। বৈষ্ণব চিন্তা ও উনবিংশ শতাব্দের জার্মান দার্শনিক হেগেলের ত্রিত্ববাদ নিয়ে সেই তুলনামূলক আলোচনা দর্শনের ছাত্রদের কাছে আজও চাঞ্চল্যকর লাগে।

আচার্য শীলের রামমোহন সাহা লেনের বৈঠকখানাটি বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতি, কথোপকথনে সরগরম থাকত। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে রামমোহন সাহা লেনের বাড়ির আড্ডা জমজমাট হত না। সেখানে আসতেন বিনয়কুমার সরকার, সুশীল মৈত্র, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ সে যুগের মগুজে পালোবানরা। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যও এসেছিলেন। তিনি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রাচ্যবিজ্ঞান প্রেমের পিছনে সূক্ষ্মভাবে তাঁর স্বদেশপ্রেমও কাজ করত না? আচার্য শীল বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। বৈষ্ণব ও খ্রিস্ট ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি।

প্রাঞ্জল কথোপকথন—যাকে বলা হয় 'কনভারসেশন'— তার বাহ্য করেছিলেন। দুজনের সাক্ষাৎকারটিও খুব মনোগ্রাহী। ব্রজেন শীল শিশুসুলভ ও সরল। কৃষ্ণচন্দ্র আত্মসমাহিত। ফলে 'কনভারসেশন'-এ এগিয়ে আসতে হয়েছিল আচার্য শীলকেই। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর 'রেমিনিসেনসেস'-এ লিখেছেন : "he spoke appreciatingly of some of my writings and made me feel at once as though we had long been working together. I found out later in conversation and in listening to his discourses... that his scholarship in philosophy... was not only very comprehensive and precise but thoroughly organised and grouped round living thoughts, each with a promise of magnificient growth."

১৯১১-১২ সালে পঞ্চম জর্জ ভারতে এলে তাঁর সম্মানার্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জ চেয়ার অব মেন্টাল অ্যান্ড মরাল সায়েন্সেস-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। আচার্য শীল সেই অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। আজ আচার্যেরই সম্মানে পদটি 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক' হিসাবে রক্ষিত। নবযুগে নবভারতে যেসব নামি দার্শনিকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের অগ্রগণ্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও এই 'চেয়ার'-এ আসন গ্রহণ করেছিলেন।

বাঙালির দর্শনচর্চার আধুনিক ইতিহাস যাঁকে ছাড়া কোনও মাত্রা পায় না, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ভারতীয় দর্শনকে বিশ্ববন্দিত করার ক্ষেত্রেও তাঁর নাম স্মরণীয়। সংস্কৃত ও ইংরিজি ভাষায় তাঁর সমদক্ষতা ছিল। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার কাজে এই ভাষাজ্ঞান তাঁকে বিপুল সাহায্য করেছিল। সংস্কৃত ও দর্শনে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তদানীন্তন 'বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সার্ভিস'-এ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সূত্রে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং অবশেষে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়েছিলেন। শিক্ষক ও পণ্ডিত হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি কেবল নিজের দেশেই সীমিত ছিল না। সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে ইয়োরোপে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে যেতে হত। বিদেশি দার্শনিকরা তাঁর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে।

সুরেন্দ্রনাথের দার্শনিক-পরিকল্পনার পুরোটাই কেবল দর্শনের ইতিহাস লেখার কাজেই লেগেছিল তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। তবে ঐতিহ্যমনস্ক সুরেন্দ্রনাথকে দর্শনচিন্তার ঐতিহাসিক বললে ভুল বলা হয় না। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তক। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতীয় দর্শনচিন্তার ইতিহাসে সমকালের সঙ্গে মহাপ্রাচীনের একটা শাশ্বত যোগসূত্র আছে। এই যোগাযোগের 'সুলুকসন্ধানই' তাঁর দর্শন-সাধনার মূলমন্ত্র বলা যেতে পারে। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' সেই সাধনারই ফলশ্রুতি। ওই গ্রন্থের মুখবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"..it is not only for the sake of the right understanding of India that Indian

সুরেন্দ্রনাথ মনোবিজ্ঞানের ভিত থেকে মানুষের মনে মূল্যবোধের উন্মেষকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এই মূল্যবোধ বা 'ভ্যালু'র প্রশ্নও দর্শনে নতুন নয়।

বিংশ শতকের গোড়ায় নব্যন্যায়ের যে নূতন জোয়ার এল বাঙলায়, তার পুরোধাব্যক্তি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

philosophy should be read, or only as a record of the past thoughts of India. For most of the problems that are still debated in modern philosophical thought occured in more or less divergent forms to the philosopher of India... The discovery of the important features of Indian philosophical thought, and a due appreciation of their full significance may turn out to be as important to modern philosophy as the discovery of Sanskrit has been to the investigation of modern philological researches".

এই মুখবন্ধ নিহিত মহৎ উদ্দেশ্য সুরেন্দ্রনাথের সারাজীবনের সংকল্প ও সাধনায় পরিণত হয়েছিল। ১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ডক্টরেট করে দেশে ফিরে আসেন। তখন থেকেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লেখার কাজে মনোনিবেশ। বাংলার তৎকালীন গভর্নর আর্ল অফ রোনাল্ডশের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। রোনাল্ডশের প্রেরণাতেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করেছিলেন। যার শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে—জীবনের শেষ প্রান্তে তখন সুরেন্দ্রনাথ, রোগশয্যায় শায়িত। ১৯২২ থেকে ১৯৫১—টানা এই এতগুলো বছরেও সেই ইতিহাস লেখার উদ্যমে ভাটা পড়েনি।

ঐতিহ্যমনস্ক সুরেন্দ্রনাথকে দর্শনচিন্তার ঐতিহাসিক বললে ভুল হয় না। বিশেষভাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তক।

বাঙালি দর্শনচিন্তাধারার পাশে পাশ্চাত্য দর্শনভুবনকে মিলিয়ে দেখার কাজটি করেছিলেন রাধাকৃষ্ণন

'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস'-এ সুরেন্দ্রনাথ যেভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাতেই গ্রন্থটি আরও বেশি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। সুদক্ষ সরল ব্যাখ্যায় তিনি বৌদ্ধ শূন্যবাদ বা জৈন অনেকান্তবাদের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেছেন। এ ধরনের বাস্তববাদী দর্শনের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। অল্প বয়সেই তাঁর অতীন্দ্রিয় ('মিস্টিক') অভিজ্ঞতা হয়। শৈশবেই তিনি এমন সব তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন যা তাঁর সমবয়সী বালকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ওই বয়সেই সুরেন্দ্রনাথকে একবার থিওসফিকাল সোসাইটিতে উপস্থিত করা হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে তাঁর প্রারব্ধ জ্ঞানের প্রমাণ দেন। হয়তো-বা এই কারণেই ক্রমশ ক্রমশ তিনি দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রতি কিছুটা অনীহাবোধ (যা তার সহজাত, তার প্রতিই অনীহা) করতেন এবং তাঁর মনন ক্রমশ বাস্তব চিন্তার দিকে ঝোঁকে। অধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগ করে, ইংরিজিতে যাকে বলে 'স্কেপটিসিজম' বলা হয়, সেদিকেই তার দর্শন-পথপরিক্রমা শুরু হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্রের মতো তিনিও সংশয়কে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন। এ দিকে তাঁর দার্শনিক কান্টের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের সংশয়প্রীতি কান্টের কঠোর বাস্তবতার ত্রিসীমানাতেও আসে না।

শিক্ষানুরাগী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে কেমব্রিজে গবেষণার জন্য পাঠান। সেখানে ম্যাকটাগার্ট, মুর ও ওয়ার্ডের মতো শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তিনি তাঁর গবেষণা ও লেখাপড়ার কাজ অব্যাহত রাখেন। ইংল্যান্ডের এই সময়টুকুই সুরেন্দ্রনাথের দার্শনিক বিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক এবং উৎকৃষ্ট বলে গণ্য করা যায়। বিলেতে থাকাকালীন তিনি ভগবদ্দর্শনের পথ ছেড়ে সংশয়ভাবাপন্ন দার্শনিক ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ হেগেলের অ্যাবসলিউটিজম্ পরিহার করেছেন এবং আইনস্টাইন ও প্রাচীন জৈনধর্মে আকৃষ্ট হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন

যে বহুদিন ধরেই নিছক ভগবদ্দর্শনে তাঁর অনীহা এসেছিল, বিশের দশকের কেমব্রিজ ও তার বাস্তববাদী আবহাওয়ায় অবশেষে মোহমুক্তি ঘটে।

সুরেন্দ্রনাথের মৌলিক দর্শন বড় আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। নাম, 'রিলিজিয়ন অ্যান্ড র‍্যাশানাল আউটলুক' (এলাহাবাদ ল' জার্নাল প্রেস)।

কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় আরও পরিচিত একটি প্রবন্ধে। উল্লেখযোগ্য যে এই প্রবন্ধটি রাধাকৃষ্ণন ও মিউরহেড সংকলিত 'সমকালীন ভারতীয় দর্শন'-এর অন্তর্গত। সুরেন্দ্রনাথের স্বকীয় চিন্তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ব্যতীত এই রচনার তাৎপর্য নিহিত লেখকের একলেকটিক বা গুণগ্রাহী চিন্তায়। সুরেন্দ্রনাথ এখানে য়ুরোপের মানবতাবাদী চিন্তার থেকেও ঋণ নিয়েছেন এবং তার সঙ্গে মিশেছে অনএকাত্মক বা আপেক্ষিক সংশয়দর্শন, জৈন অনেকান্তবাদ বা পাশ্চাত্য স্কেপটিকের অবিশ্বাসী চোখ।

অল্প বয়স থেকেই সুরেন্দ্রনাথ যে-অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেছিলেন সেই অতীন্দ্রিয়তাকে তিনি একটা মনোবৈজ্ঞানিক ফ্রেমে বাঁধিয়েছিলেন। এইটুকুই তাঁর মৌলিকতা। অবশ্য অতীন্দ্রিয় শব্দটি ব্যবহার না করলেও বাস্তববাদীরা অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ বা অন্যন্যসাধারণ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের প্রশ্নোত্তরের অন্তর্গত করেছিলেন। তবে সুরেন্দ্রনাথ মনোবিজ্ঞানের ভিত থেকে মানুষের মনে মূল্যবোধের উন্মেষকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এই মূল্যবোধ বা 'ভ্যালু'র প্রশ্নও দর্শনে নতুন নয় এবং পাতঞ্জল বা য়ুরোপীয় নবজাগরণের প্লেটোনীয় দর্শনে যে এর সম্যক পর্যালোচনা আছে তা সর্বজনবিদিত।

যে বাস্তববোধ দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে আকৃষ্ট করেছিল তার স্পষ্টতম উপস্থাপনা দেখা যায় সে যুগের আর একজন বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তববাদীর রচনায়। তাঁর নাম নিকুঞ্জবিহারী ব্যানার্জী। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরআপেক্ষিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। নিকুঞ্জবিহারী ব্যানার্জির দর্শন তত্ত্ব পশ্চিমি দর্শনের জমি থেকে উঠে আসে।

যে কোনও গবেষণাই সমকালীন ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। সারা পৃথিবীতে যখন দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটা বাস্তবমুখী ও নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির রেওয়াজ চলেছে তখন ভারতীয় দার্শনিকরা যে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কিন্তু এই সমসাময়িক প্রেক্ষাপটেও নিকুঞ্জবিহারী ব্যানার্জির মতো দার্শনিকের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁর 'কমপ্রেসেন্স থিয়োরি'— বাংলার যার অনুবাদ হয়তো সমাবস্থান—তা বাস্তববাদী দর্শনচিন্তার একটি মৌলিক তত্ত্ব বইকি! এর সাহায্যে নিকুঞ্জবিহারী মন ও জগতের অন্তঃসম্পর্কটি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে প্রাচীন আদর্শের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তববাদী চিন্তার জোয়ারে নিকুঞ্জবিহারীর 'সমাবস্থান' থিয়োরি, এবং রাসবিহারী দাস বা এম হিরিয়ান্নার সমবায় তত্ত্ব— এ সবই প্রাসঙ্গিক সংযোজন। তবে, খাঁটি বাস্তববাদী দর্শন হয়তো ভারতে তেমন করে কখনওই কদর পায়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে গত একশো বছরের চিন্তার ইতিহাসে বাঙালির যেটুকু মৌলিক অবদান ছিল তার প্রধান প্রেরণা স্বদেশী যুগের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা বাঙালি-মননে দেশপ্রেমের আবেগমথিত আত্মসচেতনতা ও ইতিহাসচেতনার জন্ম দিয়েছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের যে তাগিদ আমাদের চিন্তিত করে তুলেছিল সেই জায়গাতেই ভারতীয় দর্শন সার্থকভাবে মৌলিক। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ বা বলা যায় মহাত্মা গাঁধী থেকে এম এন রায়— এই রাজনৈতিক বা মানবিক-স্বদেশসচেতন মনীষীদের চিন্তাধারাতেই আছে আমাদের আধুনিক দর্শনের মৌলিকতা।

বাঙালি জাতিকে আত্মপরিচয় দানের তাগিদ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিল নূতন পথের অন্বেষণে

খাঁটি বাস্তববাদী দর্শন হয়তো ভারতে তেমন করে কখনওই কদর পায়নি।...পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের যে তাগিদ আমাদের চিন্তিত করে তুলেছিল সেই জায়গাতেই ভারতীয় দর্শন সার্থকভাবেই মৌলিক।

অঙ্কন : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়